মনোচিত্রকের ডায়েরি

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সাইকোলজি সবে ফিলোসফি থেকে নিজের পৃথক সত্তা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, মনোচিকিৎসক নিজের ক্ষমতা দেখাতে শু করেছে। আর কিছু পরই সাইকোলজি আর মেডিক্যাল সায়েন্সের সংযোগস্থলটি বিকশিত হয়ে আলাদা করে বেরিয়ে এসেছে সাইকিয়াট্রির চেহারা নিয়ে। তখনও এমন ছিল না। মনোরোগীর গভীর মনোজগৎকেই চিকিৎসার আওতায় আনা হতো প্রধানভাবে। কিন্তু ৰিব্যাপী টেকনোলজির দ্রুত অগ্রগতিতে নতুন নতুন সাইকোট্রপিক মেডিসিনের দ্রুত আবিষ্কারও বিপুল ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমরা আত্মসমর্পণ করে বসলাম ওষুধের কাছে। ওষুধের যুক্তিসংগত গ্রাহ্যতা সীমা অতিক্রম করে। মনের গভীরে নানা দ্বন্দ্বসংঘাত হাত উপরিতলের নানা প্রতিক্রিয়ার সমস্যা ওষুধে প্রভাবে দ্রুত প্রশমিত হতে লাগল। মানুষও চটজলদি ফল পেয়ে ওষুধের ওপর নির্ভৰ করতে লাগল বেশিবেশি। চিকিৎকদের ক্ষেত্রে অতি সহজে অল্প সময়ে ক্লিনিকে অনেক বেশি রোগীর সরবরাহ ঘটতে লাগল। অন্যদিকে টেকনোলজির প্রভাবে ট্রান্সপোর্ট রাস্তাঘাটের উন্নতিতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ সহজেই পৌঁছে যেতে লাগল শহরের হাসপাতাল, ক্লিনিক ও নার্সিংহোমে। রোগী, চিকিৎসক আর ওষুধের ব্যাবসায়ী এক বিন্দুতে এসে মিলতে লাগল দলে দলে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে আমরা জেলাও মহকুমা শহরের যে ছবিটাতে এসে দাঁড়ালাম তা হলো --- সেই ভোর থেকে ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে দূরদূরান্ত থেকে আসা লোটা কম্বল, পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে মানুষের ধরণা। প্র্যাকটিস যাঁদের দাঁড়িয়ে গেছে তাঁরা এক একদিনে দেড়শো দুশোও রোগী দেখেন। দ্রুতগতির পৃথিবী, মার্কেট ভ্যালু, অর্থনৈতিক চাহিদা, মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতা, প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অভাব --- সব কিছুর মিশেলে সাইকিয়াট্রিস্টদের চিকিৎসাও এইরকম একটা চেহারা নিয়ে নিতে পারল শুধুই নতুন সাইকোট্রপিক মেডিসিনের দৌলতে। মানসিক সমস্যাকে ক্যাটিগরিতে ফেলে ক্যাটিগরিভিত্তিক ওষুধ প্রয়োগে বেশ কিছু উপশম তো হয়ই। তাকেই পুঁজি করে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট একশো থেকে দেড়শো রোগী দেখছেন। শুধুমাত্র ওষুধ কোন্‌টা লাগবে এটুকু বুঝে নিতে যেটুকু সময় লাগে।

গ্রাম, আধাগ্রাম ও মফস্‌ললে সঠিক ও সম্পূর্ণ মনোরোগচিকিৎসার পরিকাঠামোর এতটাই অভাব এবং কলকাতাও সংলগ্ন এলাকায় সামগ্রিক চিকিৎসা এত ব্যয়বহুল যে তাদের পক্ষে এই অদ্ভুত সুলভ চিকিৎসাই হয়তো একমাত্র কথা। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে শয়ে শয়ে রোগী দেখা সাকিয়াট্রিস্টের বিপুল অর্থসমাগমের অস্বাস্থ্যকর চিহীন সামাজিক ভারসাম্যের কথা বাদ দিলাম। এর আরও বড় বিপদের দিক হলো --- ক্রমাগত বিপুলসংখ্যক মানুষের ড্রাগ ডিপেন্ডেন্সের আওতায় চলে আসা। ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানে তো এক থেকে দু’মিনিট সময়ের মধ্যে চলতি ডোজেরই এদিক ওদিক করে দেওয়া। কিছু কমানো বা কিছু বাড়ানো, যেটাকয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় নিজেরাই সেকাজটুকু আয়ত্ত করে নেয়। আর পরীক্ষামূলকভাবে যখনই বন্ধ করতে যায়, ভ্রন্দ্ধড়স্তুক্তব্রভ্রপ্ত জন্দ্ধব্রন্তুব্ধনঙ্গ-এর ফলে তার ধারণা হয়, তাহলে তো ওষুধের প্রয়োজন আছে! এরপর থেকে দু’একটা ওষুধ অনেকের আজীবন সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ক্রমবর্ধমান সেই সংখ্যা দেখে, বাজার দেখে সময় বুঝে এই ফিল্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নতুন নতুন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো অনেক বড় বড় কোম্পানি যারা এই ফিল্ডে ছিল না তাদেরও নজর পড়তে শু করেছে এই দিকে। আগামী দিনের একটা বিরাট বাজার চোখে পড়তে শু করেছে। সাইকোট্রপিক মেডিসিনে ভেসে যাওয়ার প্রতিরোধ হিসেবে দরকার ছিল

আরও বেশি সাইকোলজিস্ট, সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলার ও সাইকোলজিক্যাল সোস্যাল ওয়ার্কার সম্বলিত বিস্তৃত পরিকাঠামো বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। প্রয়োজনীয় ট্রেনিং কোর্স শু করা। বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ানো কিন্তু বর্তমান সামগ্রিক অবস্থা ভয়ঙ্কর হতাশজনক!

লিখতে বসে তাই মনে হলো শুধু নির্দিষ্ট কোনো রোগীর কাহিনীই বা কেন, আমার কাছে অনেক জেলা থেকে আসা রে াগী, তাদের দুর্ভাগ্য, ক্ষোভ, আক্ষেপ নিয়ে যে ছবি গড়ে উঠেছে সেই চিত্রটাকেও তো তুলে ধরা দরকার মনোচিত্রকের প াতায়!

মেদিনীপুর জেলার কোনো এক মফস্‌সল শহরের এক ব্যস্ত ওষুধের দোকান ধণ 'জীবনদীপ মেডিসিন'। পাশাপাশি ঐ অঞ্চলটায় আরও অনেক ওষুধের দোকান, ল্যাবরেটরি, নার্সিংহোম গিজগিজ করছে। ভোর থেকে সামনেটা ঝাঁট দেওয় া, জল ছিটানো, বেঞ্চিগুলোবাইরে বার করে সামনেটার সার বেঁধে পেতে দেওয়া, কাউন্টারে গণেশের মুর্তিতে ধূপ দেওয়া ডাক্তারদের নামলেখা বোর্ডগুলো সামনে এনে রাখা। তারই মধ্যে ভিড় জমতে শু করেছে গ্রাম্য আর আধা শহরের মানুষের। এদের মধ্যে জীবনদীপ একটু দূর অনেকটা জায়গা নিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে। জীবনদীপের ব্যাপার একটু আলাদা। কলকাতা থেকে নতুন কোনো ডাক্তার এলে মাইকে লিফলেট সহ'আনন্দ সংবাদ' বলে সারা শহরে প্রচার করা হয়। এ অঞ্চলে জীবনদীপের সঙ্গে পেরে ওঠে না কেউ। কলকাতার বড় ডাক্তার সবচেয়ে বেশি জীবনদীপেই আসে। শোনা যায়, হাই লেবেলে কিভাবে ওদের যেন যোগাযোগ আছে। এম.এল.এ,পুলিশ অফিসার, এস.ডি.ও, মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার, পার্টির নেতাদের কলকাতার ডাক্তারকে লাইন না দিয়ে দেখিয়ে দেবার আলাদা ব্যবস্থা আছে। তাঁদের জন্য এটা জীবনদীপের একটা ফ্রি সারভিস, বলা যায় গিফ্‌ট। বোর্ডে সব বাঘা বাঘা ডাক্তারের নাম। একই সঙ্গে তিন - চারটে চেম্বার চলে। ডাক্তারের গাড়ি, ভ্যান, রিকশা, সাইকেল, আর রোগীর ভিড়ে প্রায় মেলা বসে যায়। বেঞ্চি উপচে মাটিতে কাছাকাছি গাছতলাগুলোয় ভিড় চলে যায়। ওষুধের কাউন্টারের সামনে পৌঁছাতে গেলে সময় লেগে যায়। রবিবার দিনটা জীবনদীপের সবচেয়ে বড় মেলার দিন। ঐদিন কলকাতা থেকে কোনো এক মেডিক্যাল কলেজের ধন প্রফেসর সাহা আসেন, সকাল আটটা থেকে রাত নটা। সেদিন আরও অনেক নতুন চা-ওয়ালা, বাদামভাজা, মোবাইল পান বিড়ি সিগ ারেট, ফুচকা, জিলিপি, আইসত্রিম, তেলেভাজা জীবনদীপ চত্বরে।

প্রফেসর সাহার সঙ্গে জীবনদীপের চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে কলকাতা থেকে গাড়ি করে নিয়ে আসা, দিয়ে আসা আর দু - রা ত্রি সহ সারাদিন থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা এ দায়িত্ব জীবনদীপের। সারাদিনে শ'দেড়েক রোগী তিনি দেখবেন। শ'দেড়েকের কম হলে এতদূর থেকে যাতায়াত, দুরাত্রি বাইরে থাকা এসব তাঁর পক্ষে অসুবিধার। ওষুধ বিত্রি যা হবে, তাতেই জীবনদীপ ফুলে ফেঁপে উঠবে যদিও, তবু প্রফেসর সাহার কাছে জীবনদীপের একটা আবদার --- আসলে এতদূর রাস্তা গা ড়ি করে দিয়ে আসা, নিয়ে আসা তো! একটা ব্যাপারে আমাদের একটু দেখতে হবে স্যার। ঐ একটা‗নব্ধন্দ্বজ্জন্ধন্ত টনিক অ াছে স্যার, ওটা আমাদের নিজেদের প্রোডাক্ট। ওটা একটু দেখতে হবে স্যার! এখানে যাওয়া আসা থাকা খাওয়া ব্যপারে স্যার আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। স্যার ওটা জীবনদীপের ওপর ছেড়ে দিন। জীবনদীপ যখন আছে, ওখানে আপন াকে কেউ ডিসটার্ব করারই সাহস করবে না।

এরপর থেকে নিয়মিত প্রত্যেক শনিবার বিকেলে জীবনদীপের গাড়ি প্রফেসার সাহাকে কলকাতায় তাঁর ম্যান্ডেভিলা গ ার্ডেনের বাড়ি থেকে নিয়ে রওনা হয় বোম্বে রোড ধরে মেদিনীপুর জেলার দিকে। ব্রিফকেশের ওপর বগলটা রেখে পান মুখে শরীরটা এলিয়ে দেন অ্যামবাস্যাডারের সিটে। শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সামনের দিকে এগিয়ে থাকা তাঁর ঈষৎ উঁচু কোট। বাইরে যখন পেরিয়ে যায় হাওড়া জেলার বিকেলবেলার ধানক্ষেত, মাঠ আর দিগন্ত, তখন গাড়ির জানলা দিয়ে আসা হাওয়ায় মিষ্টি একটা ঝিমুনি আসতে থাকে। আধবোজা চোখে আলতো একটা হাসি লেগে আছে। ঝিমুনির ফাঁকেই ড্রাইভারকে বললেন, হাওড়া জেলাটা বেশ, না! হঠাৎ ঘুম ভাবটা কেটে যায়। সিটের ওপর সোজা হয়ে বসেন। মনের ভেতরের একটা হিসেব বাইরের দুই ভুকে কুঁচকে দেয়। সারা মাসে যা‗নব্ধন্দ্বজ্জন্ধন্ত লেখেন, তাতে ওদের যা মার্জিন থাকে, গাড়ি আর হোটেলের খরচ সে হিসেবে তো কিছুই না। তাহলে ওরা বিয়ারের দামটা দেবে না কেন? বলতে হবে তো গোবিন্দকে!

প্রত্যেক শনিবার রাত্রে পৌঁছে গোবিন্দর কাছে প্রথম যেটা জানতে চান, তা হলো কাল কত পেসেন্ট পেয়েছো? দেড়শ অ

াছে তো? রবিবার সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট সেরে বসে পড়েন রোগী দেখতে। দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে সকালেই পৌঁছে যায় রোগীরা। সকালআটটা থেকে রাত নটা, শ'দেড়েক ছাড়িয়ে যায়। মাঝে লাঞ্চের ব্রেক। এই লাঞ্চটা জবরদস্ত হয়। চিকেনটা কেন যে সবাই এত খায়। চিকেন একদম পছন্দ হয় না প্রফেসর সাহার। মাটন আর ইলিশ রাখতেই হবে। ম াটনের হাড় চিবোতে চিবোতে গোবিন্দকে রাতের বিযারের ব্যাপারটা শুনিয়ে রাখতে ভোলেন না।

লাঞ্চ ব্রেকে বাইরের ভিড়েও একটা ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। আবার শু হতে ভিড়টা গা ঝাড়া দিয়ে চনমনে হয়ে ওঠে। ব াইরের ভিড় থেকে একজন রোগী ভেতরে ঢোকে, আর একটু বাদেই একটা কাগজ হাতে বেরিয়ে আসে। দেখতে দেখতে কাউন্টারে জমে যায়মানুষের ভিড়, শোরগোল --- সবার হাতে একটা করে কাগজ, যে কাগজে কয়েক মাসের ওষুধ লেখ া। পলিব্যাগে ভর্তি কয়েক মাসের ওষুধ নিয়ে ভিড় থেকে মানুষ ছড়িয়ে পড়ছে নানা দিকে। দু - তিন জন অন্তর একেক জনের বগলে একটা করে ভিটার্জির বোতল। পলিব্যাগ ভর্তি ওষুধ আর ভিটার্জির ছড়িয়ে পড়ছে বাজারে, বাস রাস্তায়, পাকা রাস্তা ছাড়িয়ে মেঠো পথে। পাশের গ্রামের আলপথে দেখা গেল ভিটার্জি চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে সাঁকোর ওপর দিয়ে, ভিটার্জির ভ্যানে বসে আছে। জীবনদীপের বাইরে বাদাম ভাজা, চা সিগারেটের চিৎকার। ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে এসে একটি মেয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, আমার তো কোনো কথাই শুনলেন না। কথা শুকরতে না করতেই ওষুধ লেখা হয়ে গেলো। আমি তাহলে এই ওষুধ খেয়ে কি করব? কাউন্টারের লোক রে রে করে উঠল। আপনি ডাক্তারের থেকে বেশি বোঝেন? বড় ডাক্তারের রোগ ধরতে বেশি সময় লাগে না। উনি কলকাতার কত বড় ডাক্তার জানেন? ওনাকে অ ামরা পেয়েছি এই ভাগ্যি।

ঐরকম জবরদস্ত লাঞ্চের পরে যদিও একটা ঝিমুনি চেপে ধরে, তবু ওরই মধ্যে চালিয়ে যাওয়া যায়। বেশি ঝিমুনিতে বদন ামের ভয় আছে, তাই বিকেল চারটে নাগাদ এক কাপ গরম কফি পাঠিয়ে দেয় গোবিন্দ। ইউনিভার্সিটিতে পড়া একটি মেয়েকে নিয়ে ঢুকল তার মা। মেয়ের ভীষণ টেনসন, প্রত্যেক পরীক্ষার আগে অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রফেসর সাহা বলে উঠলেন আরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিন।ওবিয়ে দিয়ে দিলেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। কলেজ তো পাশ করেই গেছে, আবার কি! সে যদি পড়তেই হয়।শুরবাড়ি থেকে না হয় পড়বে। বলে কয়ে নেবেন। বিডিও অফিসের এক কেরানি দেখাতে এসেছেন। বড় অফিসার বা তাঁর উপরের পদস্থ কোনো মানুষের মুখোমুখি হতে তাঁর ভয়। প্রফেসর সাহা ওষুধ লিখতে লিখতে বললেন, আরে বিপদের মধ্যেই তো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। দেখবেন ঠিক রাস্তা বেরিয়ে গেছে। অ্যাভয়েড করবেন না। --- কি বলছেন ডাক্তারবাবু! বিপদের কথা চিন্তা করতে গেলেই তো আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, আর ঝাঁপিয়ে পড়তে বলছেন! --- আরে আমাদের জীবন তো সব সময়ই বিপদসঙ্কুল, তার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। --- কিন্তু সে স াহসটাই তো আমার নেই, জীবন তো সব সময়ই বিপদসঙ্কুল শুনে আমার ভয় তো আরও বেড়ে গেল, আপনাকে তো সেই সাহসটাই করে দিতে হবে ডাক্তারবাবু। ---আরে সাহস করলেই সাহস, না করলেই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা! নেক্সট্, গে াবিন্দ নেক্সট্ পেসেন্ট পাঠাও। ওই ওষুধগুলো তিন মাস খেয়ে আমাকে দেখাবেন।

এক অল্পবয়সী গৃহবধূ এল দেখাতে। সব সময় মাথা ঝিমঝিম করে, বুক ধরফড় করে, গা হাত পা কাঁপে। শাশুড়িকে খুব ভয় লাগে। শাশুড়ি এত আজে বাজে কথা বলে, স্বামী খুব মা ভক্ত। মুখে মুখে উত্তর দিতে গিয়েও দিতে পারে না, ভয়ে শরীর থর থৰ করে কাঁপে। অথচ এত অপমানজনক কথা বলে; কিন্তু না বলতে পারলেও শৰীর অস্থির করে, মাথা ঘোরে - -- বলা শেষ হতে এক গ্লাস জল খেয়ে সে দেখে ডাক্তারবাবুর ওষুধ লেখা হয়ে গেছে। --- ওই ওষুধগুলো দু'মাস খেয়ে আমাকে জানাবে। ও সব শাশুড়িই ওরকম একটু হয়। সব বাড়িতেই হয়। আরে দুটো কান আছে কি করতে! কথা একটা দিয়ে শুনে আর একটা দিয়ে বার করে দেবার জন্য। কই গোবিন্দ, আর কজন আছে?

রাত নটায় জীবনদীপের সামনের চত্বরটা নির্জন হয়ে আসে। মুড়ির ঠোঙা, বাদামের খোলা, পোড়া বিড়ি, আর কাগজের টুকরোর নির্জনতা। যারা এসেছিল তারা সবাই একটু পরে জেলার নানা জায়গায় ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে গভীরভ াবে। প্রত্যেক সোমবার ভোরে গোবিন্দ প্রফেসর সাহাকে অ্যাম্বাস্যাডারে তুলে দিয়ে নোট ভর্তি ব্রিফকেশটার দিকে দেখিয়ে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে এই কথাটা বলে, প্রত্যেক সোমবার বলে --- স্যার একটু খেয়াল রাখবেন, একটু সাবধানে যাবেন কিন্তু।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com